সাধু শিবচরণের গোজেন লামা

ইন্দ্রলাল চাক্‌মা বিএ.বি.এড

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvananda Bhante

এখন মনবাঞ্ছা পূরণের সময়। তাঁর মনবাঞ্ছা পূরণের জন্য তাঁর ৫ম লামা গীত নিম্নোক্তভাবে নিবেদন করেছেন।

পাচ লামা

তদাৎ বেরেই কাবরান
ভুজিলুং গোজেনর চরনান।

চরণে সালামে ভুজিলে
সগল তীথ্য ফল পায় ভিলে।

পাচ ফুল দানফল পেদুং গোয়
রদে বলে মুই হদুংগোয়।

গোজেন সমুগে কহ্র পাদং
সাতপুত চেই চেদি বরমাগং।

ডেনে মাগং ধনবর
বাঙে মাগং জনবর।

ধনে সম্পদে সবপুরা
জুরি পার্তুংগোয় য়েহ্টঘরা।

যেবর মাগঙর মন সাধ
সে বর পেদুংগোয় হাদে-হাদ।

আহ্ল্যে আবুজিলে লেয় সাধি
জুম্ময়া আবুজিলে তংসাধি।

দেবান আবুজিলে বীর সাধি
রাজা আবুজিলে চক্রবর্তী সাধি।

কেয়াৎ পেদুং সাজানা
তিরিচ তিন জাদত্তুন পেদুংগোয় খাজানা।

খাদে পালঙে বোয়খেদুং
তিরিচ তিন জাতি ভাচ মুই পার্তুং।

যেবর মাগঙর মনর সাধ
সে বর পেদুংগোয় হাদে-হাদ।

গীদ পাচ লামা ফুরেই যার
তদা সাধঙর আরবার।

-০-

পরম গোজেন দয়াময়। তবে শুধু খালী হাতের প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন না। প্রার্থনা নিবেদনের পূর্বে সাধককে অবশ্যই নানাবিধ নিয়ম পালন করতে হবে। পঞ্চফুল বা পঞ্চশীল পালন করেই সেই প্রার্থনা সমর্পণ করতে হয।

পাচফুল দানফল পেদুংগোয়
রদে বলে মুই হোদুংগোয়।

পাঁচফুল বলতে ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত পঞ্চশীলকে বুঝানো হয়েছে। পঞ্চশীলের মধ্যে (১) তিনি প্রাণী হত্যা করেন নাই। (২) সুরাজাতীয় পানীয় গ্রহণ করেন নাই (৩) মিথ্যা কথা কলেন নাই (৪) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই এবং (৫) পরদার গমনে বিরত থেকেছেন এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করে তিনি নিজেকে শুচি ও পবিত্র করেছেন। কায়মনবাক্যে তিনি কোন পাপ করেন নাই।

অপরপক্ষে চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আগরতারা অনুসারে পঞ্চ নীতির ব্যাপারে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে-"আউ স্বাহা রূপ্পাং আউলা কাম্মীও লুড়িয়াং পাব্বাস্রাং- (১) আয়াদ্দেকাং (অধিবাস) পৃথিবী সম (২) সেন্নাং (স্নান) জলসম (৩) কুরুক্কাং (ব্রহ্ম) আগুন সম (৪) ডাইসে (বায়ূ) বাতাস সম ও (৫) পার্থাং (পাত) আকাশ সম। এই পঞ্চশীল পাপ বিনাশ, আত্মা উদ্ধার, দান বিধান ও নির্বাণ মুক্তি জ্ঞানের অস্ত্র স্বরূপ। প্রতিটি মৃত্যু আত্মা ও সমষ্টিগত মৃত্যু আত্মা উদ্ধারের জন্য সাপ্তাহিক ক্রিয়া, আগবাড়াহ্, পিন্ডুপূজা বা ভাতদ্যা অনুষ্ঠান চাকমা সমাজে বিদ্যমান।" **সুত্র ঃ-** স্বধর্ম্ম পথে-শ্রী আঙু ফলচান কার্বারী (আগরশাস্ত্রী)।

আগরতারা শাস্ত্রে বর্ণিত পঞ্চনীতি তিনি যথাযথ ভাবে পালন করেছেন। পরম গোজেনের কাছে তাঁর প্রাপ্তির জন্য এখন দাবী করার আর কোন বাঁধা রইল না।

"উং চক্রের মূল তত্ব চংগের মাহাত্ম্য
ফুল চক্র পঞ্চ রথী, পঞ্চ মহাসত্য।"

ধর্ম রক্ষাকারী এবং প্রচারকার চংগ যাঁরা স্বধর্ম পথে আনিয়া জাদি (আহুনীয়া) আব্বিয়া জাদি (আহ্বানীয়া) পানিয়া জাদি (পাহুনীয়া) দুক্ষা জাদি (দুক্ষণীয়া) মন্ত্রে দশনখ ধৌতজল (হাত ধৌয়া মন্ত্র) দ্বারা রাউলী বা লুথাকপণ পিন্ডপূজা বা জাদিপূজা করে থাকেন তার মাহাত্ম্য তিনি বুঝেছেন, জেনেছেন ও সেবা করেছেন। এখন তার পাওনা আদায়ে ভাবনা কি?

এখন তিনি ডান বাম উভয় দিকে পরিপূর্ণ হতে চাহেন। এক হাতে যেমন কোন কার্য সফলভাবে সিদ্ধ করা যায় না ঠিক তদ্রুপ ধন ও জন উভয় ক্ষেত্রে সমান না হলে সুখ পাওয়া যায় না।

"ডেনে মাগং ধনবর
বাঙে মাগং জনবর।"

শিবচরণ উভয় সম্পদই পরম গোজেনের কাছে পাওয়ার প্রার্থনা করেন।

শুধু ধনজন হলেই চলবে না। অল্পতেই তিনি তুষ্ঠ নহেন। প্রচুর পরিমানে সে সম্পদ পেতে চান।

"ধনে সম্পদে সবপুরা
জুড়ি পারতুং গোয় য়েহট ঘরা।"

ধন সম্পদ তিনি এমন চান যে পরিমাণ ধনে তিনি হাতি ও ঘোড়া কিনতে পারেন। হাতি ঘোড়া রাজার সম্পদ। সে সম্পদ রক্ষা করতে হলে যেমন চায় তাঁর শক্তি তেমন চায় তার লোকবল। তিনি মন ও প্রাণ উজার করে একান্ত ভক্তি চিত্তে বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছেন যাতে তাঁর প্রার্থনা বৃথা না যায় যাতে তিনি হাতে হাতে সেফল লাভ করতে পারেন।

"আহল্যা আবুজিলে লেইয় সাধি
জুমমুয়া আবুজিলে তংসাধি।"

পন্ডিত প্রবর বাবু সুগত চাকমা, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও গবেষক "চাকমা জাতি পরিচিতি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে শিবচরণের গীত লামা গুলো বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে দুষ্ট। এক্ষেত্রে "লাই" ও "টং" শব্দকে তিনি আরাকানী ভাষা লাই অর্থ জমি এবং "টং" অর্থ পাহাড় উল্লেখ করেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি যদি ভবিষ্যত জন্মে চাষীর ঘরে জন্ম নেয় তাহলে তাঁকে হতে হবে অগাধ ভূ-সম্পত্তির মালিক বা জমিদার। আর যদি তিনি জুমিয়ে হিসাবে জন্ম নেন তাহলে তাঁকে হতে হবে পার্বত্য রাজা বা বহু পাহাড়ের দখলদার মালিক।

চাকমা ব্যবহৃত শব্দে "লাই" অর্থে ধান ভর্তি করার ঝাঁপি। লাই ভর্তি করেই তো গোলাভর্তি করা হয় ধানে। ফসলে ভর্তি হবে ভূমি। পূর্বে চাকমারা লাঙ্গল দ্বারা চাষ করতো না। তাই "হাল্যা" হতে হলে বিপুল সংখ্যক গো-মহিষাদি থাকা প্রয়োজন। যাদের দ্বারা তিনি তাঁর বিশাল ভূমি লাঙ্গল দ্বারা চাষ করতে পারেন। তিনি একজন "বড় হাল্যা" চাষা রূপে পরিচিত হতে পারেন। ভূমির অধিকারী রাজাও হতে পারেন।

আর যদি তিনি জুমিয়া হয়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে তিনি গ্রামে বাস করতে চাহেন না। গ্রামে বাস করা নানা ঝামেলার। পরিবার পরিজন নিয়েও তিনি থাকতে চাইবেন না। জুমের ক্ষেতে বাস করা আনন্দ অপার। জুমিয়ার খামার ঘরটি জুমের মধ্যখানে থাকে যেখান হতে জুমিয়া তার ফসল তদারক করতে পারে। কারণ জুম ক্ষেতে শত্রু অনেক। জুম ক্ষেতের বাহিরে থাকে ছোট ছোট কুঞ্জবন। সে বনে থাকে নানা রঙের পাখী ও নানা জাতীয় পশু ও সরীসৃপ। বনের শুকর, বনরুই, হরিণ, বানর ও কাঠবিড়ালী সারাক্ষণ থাকে জুমের আশে পাশে। বনমোরগ, তোতা, পায়রা সব সময় চেয়ে থাকে ধান ক্ষেতের দিকে। জুমের কচি ধান ক্ষেতে কখন যে বনের হরিণটা ধান খেয়ে যায় টেরই পাওয়া যায় না। বনমোরগ গুলো পরিবার পরিজন সহ উড়ে এসে পাকা ধান খাওয়া শেষ করে মনের সুখে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে কুক-রুকুক-কুক-কুরু-কুক শব্দে ডেকে। ইহাদের আচরণ বিরক্তিকর হলেও শিবচরণের খুবই পছন্দ হয় তাদের। কারণ গোজেন তাদেরও সৃষ্টি করেছেন পরমানন্দে।

পার্বত্য এলাকায় যে দিকে তাকানো যাক না কেন দেখা যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। কোন কোনটা হেলানো, কোনটা সোজা ও আকাশ ছোঁয়া, এবড়ো খেবড়ো, নানা ধরনের নানা আকারের পাহাড়গুলো সৃষ্টি হয়েছে অনাদি কালে। কখনো কল্পনা করলে ইহাদের আকার হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, সাপ, কুমির ইত্যাদি আকারের মত দেখায় তাদের গঠন। পরম গোজেন নিঃসীম আকাশ তলে সে সব পাহাড় সাজিয়ে রেখেছেন। পাহাড়ে জুম চাষ করে আরও অনেকেই। জুমিয়াদের ভাষা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরম গোজেনের কাছে শিবচরণ এতদিন অনেক কাকতি মিনতি করেছেন। তাঁর নিকট তিনি সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করে কান্নাকাটি করে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। বারবার গীত গেয়ে আনন্দ কলরবে রেইং দিয়ে কখনো উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তিনি পরম গোজেনের কাছে কোন বস্ত্র দান করেন নাই। তিনি গরীব তাই মূল্যবান বস্ত্র ক্রয় করে দেওয়ার তাঁর সামর্থ্য নাই। বস্ত্র দিয়ে তিনি কি করবেন? কারণ সবকিছুইতো তাঁরই সম্পত্তি। তাঁর সৃষ্টবস্তুতে তাঁরই অধিকার আছে একমাত্র। তিনি কোন পূজার অর্ঘ্য চান না। তিনি চান ভক্তের ভক্তি। তাই তিনি বার বার ৬ বার গলায় পবিত্র সাদা কাপড় পেঁচিয়ে হাত জোড় করে অতি বিনীতভাবে পরম গোজেনের আরাধনা করছেন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য। ভক্তের ইচ্ছা পরম গোজেন কোথায় আছেন তা জানার জন্য। তিনি কি নিরাকার না সাকার? তিনি কোথাও নাই আবার সবখানেই তিনি বিরাজমান আছেন। তিনি আছেন মাতাপিতার প্রতি পরিপূর্ণ ভক্তিতে। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি নিবেদন ছাড়া এবং তাঁদের আশীর্বাদ পাওয়া ছাড়া গোজেন ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন না।

"মাতা পিতার ভক্তি লং
সাতভেই সাতবোন বর মাগং।"

মাতা পিতার ভক্তির মধ্যে, সাতভাই সাতবোনের শক্তির মধ্যে পরম গোজেনকে পাওয়া যায়। তাদের স্নেহ মমতার মধ্যে গভীর ভালভাসাভাসীর মধ্যে পরম গোজেনকে পাওয়া যায়। তিনি ভক্তের মধ্যে অবস্থান করেন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে। এ জগতে যা কিছু সুন্দর সবখানেই পরম গোজেন বিরাজমান আছেন এবং তাঁর আশীর্বাদে সোন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। গুরু জনের মধ্যে, দেবগণের মধ্যে কখনো এককভাবে এবং কখনো বহুধা বিভক্ত হয়ে তিনি আবির্ভুত হন ভক্তের কাছে চুপে চুপে। এতদিন পর্যন্ত তিনি যে গীত গেয়ে এসেছেন সব কিছুই তো পরম গোজেনের প্রতি প্রশংসা ও শ্রদ্ধা রেখে। এইবার শেষবারের মত আবার তিনি তার ইস্পিত আশা পূরণ করে দেওয়ার প্রার্থনা নিবেদন করছেন। কারণ তাঁর কাছে বার বার প্রার্থনা নিবেদন করে তাঁকে স্মরণ করে দিতে হয়। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে ভক্তের আশা পূরণ হয় না। আশা অপূর্ণ ব্যক্তিরা জন্ম জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করে। সংসারের প্রতি তাকালেই তা দেখা যায়। সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই তাঁকে নিরাশ করবেন না। কারণ তিনি তো তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সবকিছু করেছেন। তিনি তাঁর ছয়লামা গীত নিম্নোক্ত ভাবে পরিবেশন করেছেন।

ছয় লামা

তদাৎ বেরেই কাবরে
আরার্ধনা গরঙর আদ জোরে।

মাতা পিতার ভক্তি লং
সাতভেই সাতবোন বর মাগং।

এগ (এগার) হাজার চুরাশি সন
জন্মেল বুধবারে (ফলনা বারে) শিবচরণ।

হাদে ঢালি পানিয়ে
দিব মা বসুমমতী সাকখিরে।

চরণে সালামে ভজঙর
যেবার মেলানি মেলঙর।

গীদ ছ'লামা ফুরেইয়ে
বুঝিলে বুঝিবে মানেয়ে।

দেবর কুলে দেব মানায়
মানেই কুলে লোক মানায়।

কুদু গেলা সঙ্গী ভেই
সাধি সমারে চলি যেই।

ফুরেইয়ে ছ'লামা ফুরেল
গোজেন চরণৎ মন রল।

-০-

সাধক শিবচরণ জন্ম গ্রহণ করেন বুধবারে (ফলনা বারে) এক (এগার) হাজার চুরাশী সন। ইহা নিয়ে চাকমাদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। বৃটিশরা আসার পূর্বে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত কোন সন গণণা কত না। বঙ্গাব্দ, মঘাব্দা, ত্রিপুরাব্দ শকাব্দ, হিজরী সন ইত্যাদি। তাছাড়াও ভারতীয় দার্শনিকগণ পর্যায়ক্রমে সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলি যুগের বছরও হিসাব করে থাকেন। সম্ভবত চাকমা রাজাদের সাথে আরাকানী রাজাদের সম্পর্ক ছিল ধর্মীয় ভিত্তিক। তাছাড়া তখন চট্টগ্রামে মগদের প্রভাব

ছিল বেশী। সে হিসাবে মঘান্দ হিসাবটা সঠিক বলে ধরে নেয়া হয়। পন্ডিত প্রবর বাবু সুগত চাকমা একদিন কথায় কথায় বললেন সূর্য বৎসর, চান্দ্র বৎসর কত বছরই না আগে প্রচলিত ছিল এবং কবিদেরও নিজস্ব (কোড) সাংকেতিক চিহ্নিত বছর ছিল। তাই তাঁরমতে এসব বিতর্কে না গিয়ে তখনকার সময়ে অঞ্চল ভিত্তিক প্রচলিত সন ধরাই যুক্তি যুক্ত বলে তিনি মনে করেন। জন্ম সনের বিতর্ক শিবচরণের অধঃস্থন পুরুষ প্রয়াত যামিনী রঞ্জন চাকমা তাঁর প্রথম খন্ডে প্রকাশিত পুস্তিকায় শিবচরণের জন্ম সন ও মূল গ্রন্থ নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করেছেন।

"গোজেন লামাটা শিবচরণের কৈশোরে আরম্ভ ও যৌবনেই সমাপ্ত। ইহা চাকমা অক্ষরে চাকমা ভাষায় লিখিত। রচনাকাল থেকে বিভিন্ন লোকের দ্বারা ইহার নকল করার কাজ হচ্ছিল এবং এখনও হচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু শব্দের বানান ভুল হয়ে ভিন্ন অর্থ হয়েছে। যেমন দ্যং মূলে হয়েছে দেয় (২য় লামা) এগ স্থলে হয়েছে এগার, বসুমমতী স্থলে হয়েছে সরস্বতী (ছয় লামা)। এখানে যে গোজেন লামাটা লিখা হলো তা পেয়েছি বংশী নাথ থেকে। বংশী নাথ হলো শিবচরণের অধিঃস্তন তৃতীয় পুরুষ (প্রপৌত্র)" (চাকমা দর্পণ পৃঃ ২১, ১ম খন্ড-শ্রী যামিনী রঞ্জন চাকমা)"

মহাকালের আবর্তে একদিন সবকিছু ধ্বংশ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে প্রতিটি মানুষের কর্মের ফল। তখন তিনি যে কাজ করেছেন তা মহা পৃথিবীকেই সাক্ষী রেখেই করেছেন। তার যা কিছু ছিল সব উৎসর্গ করেছেন নিজ হাতে পানি ঢেলে।

"হাদে ঢালি পানিয়ে
দিব মা বসুমমতি সাকখিরে।"

সৃষ্টির আদি হতে চাকমারা বিশ্বাস করে মাটি, জল, তেজ ও বায়ু এ চারি ধাতু দ্বারা পৃথিবী ঘঠিত। এ চারি ধাতুর একটির সঙ্গে আর একটির আছে নিবিড় সম্পর্ক। গোজেন সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমেই জল সৃষ্টি করেছেন তারপর স্থল সৃষ্টি করেন ইহার পর জীবসকল।

"জল উবরে বচ্যে থল
বানেল গোজেনে জীবসকল।"

বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবে দানের উৎসর্গ মন্ত্রে "ইদংমে এ্ঞাতিনাং হোতু সুখীতা হোন্তু এ্ঞ্যাতায়ূ" এ দানের ফলে জ্ঞাতিগণ সুখী হোক বলে পানি ঢালতে হয়। তা না হলে মৃতাত্মা দানের ফল প্রাপ্ত হয় না।

শিবচরণ এযাবতকাল পরম গোজেনের আরাধনায় ব্যস্ত ছিলেন। যাওয়ার কথা কখনো বলেন নাই। তাঁর যাবার সময় এখন এসেছে। প্রত্যেক কিছুর একটা শেষ পরিণতি আছে। তিনিও তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। শেষ বারের মত তিনি গেয়ে চলেছেন।

"চরণে সালামে ভজঙর
যেবার মেলানি মেলঙর"

শিবচরণ গোজেনের চরণ ভজনা করে বিপুল শক্তি লাভ করেছেন। মেলঙর কথাটির দ্বারা বিভিন্ন অর্থ বুঝানো যেতে পারে। পাখামেলা হলে যাওয়ার উপায় হিসাবে তিনি পাখা মেলছেন। "কথা মেলা" খোলা মেলা কথা তিনি বলে যাচ্ছেন। সব কিছু বলে যাচ্ছেন যাবার বেলায়।

শিবচরণ তাঁর প্রার্থনার ফল একা ভোগ করতে চান না। তিনি একথাটি বার বার বলেছেন। তিনি সবাইকে নিয়ে সে ফল ভোগ করতে চান। সবাইকে তিনি বুঝাতে চান পরম গোজেনের গুণাবলী, ক্ষমতা ও তাঁর দয়া। তিনি দয়ার সাগর। কিন্তু শিবচরণের মনের দুঃখ ও তাঁর আশার কথা সবাই বুঝেনা। বুঝলে ভাল হত। পন্ডিতেরা আকারে ইঙ্গিতে বুঝেন। অবুঝ লোকেরা তা বুঝে না। এবং সেই অবুজ লোকের সংখ্যায় বেশী।

গীদ ছ'লামা ফুরেইয়ে
বুঝিলে বুঝিবে মানেয়ে।"

যারা মানুষ, যাদের চিন্তা শক্তি ও বুঝার জ্ঞান আছে তারা তাঁর আবেদন হৃদয়াঙ্গম করতে পারবেন। যারা অবুঝ তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিবে না। এ পৃথিবীতে জীবকুলের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির বৈচিত্রে মানবই সুন্দর। জীবজগতে টিকে থাকার জন্য তার যে শক্তিশালী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সেরূপ অন্যদের নেই। মানবকূলে একমাত্র মানুষকেই মানায়। স্বভাবে, আচরণে, হাসিকান্না প্রেম নিবেদনে নারীপুরুষ সম্মিলিত ভাবে মানুষের জীবন যাপন কি সুন্দর! অপর পক্ষে দেবকুলে দেবতারা নানা বেশ ধারণ করে নানা শক্তিতে ভর করে তারা একস্থান হতে অন্যস্থানে গমণ করে। দেবকুলেও দেবতারা মানবের চেহারা ধারণ করে। মানবের মত তারা দুঃখ কষ্টে জীবন কাটায় না। তারা কোন চাষাবাদ করে না, গৃহপালিত পশু পালন করে না। অথচ তাদের কোন অভাব হয় না। গোজেনের ভজনা করে তারা দীর্ঘকাল সুখে জীবন যাপন করে। এ পৃথিবীতে একজন ধনী লোক যেভাবে সুখে দিন কাটায় যেরূপ আনন্দ উপভোগ করে, ক্রীড়া করে, যেরূপ নাচ গান ও আনন্দ উৎসবে মত্ত থাকে তার চেয়ে

বহুগুণ বেশী দেবপুরীতে সুখ ভোগ করে। সেই আনন্দ পুরীতে একমাত্র দেবগণেরই প্রবেশের অধিকার আছে। সেখানে একমাত্র দেবগণকেই মানায় অন্য কাউকে নহে।

মানুষের মত দেবপুরীতে দেবগণের জন্ম, মৃত্যু হাহাকার অসুখ, বিসুখ জ্বালা, যন্ত্রণা কিছুই নাই। পুণ্য ফলের দ্বারা তারা যখন যা চায় তখন তা পায়। যখন যা খাওয়ার ইচ্ছা করে, দৈবশক্তি বলে সে সব খাবার তখন সেখানে উপস্থিত হয়। এমন সুন্দর বাগান বাড়ী, গাড়ী ঘোড়া উড়ন্ত বিমান সেখানে যা দেখা যায় পাওয়া যায় তা পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারেনা।

সকল মহাপুরুষগণ দেবপুরীর সৌন্দর্য ও সুখের বর্ণনা করে দেবপুরীতে যাওয়ার জন্য সৎকাজ করার কথা বলেছেন। দেবলোকেও কর্মভেদে উচ্চকূল ও নীচকূলে জন্ম নিতে হয়। অনেক দেবগণের আয়ু দীর্ঘ অনেকের অল্প। অযৌনী সম্ভূত দেবতারা হতাৎ হতাৎ আবির্ভুত হন সেখানে। মাতৃ জঠরে থেকে জন্ম দুঃখ ভোগ তারা করেন না। পুণ্যফল শেষ হলে মৃত্যু দুঃখ ভোগ না করে হতাৎ অর্ন্তহিত হয়ে অন্য ভূবণে অন্যকূলে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীতে জন্ম নিলেও তাঁরা রাজকূলে, ধনীকূলে সুসময়ে জন্ম নিয়ে উন্ননতর আধ্যাত্মিক সাধনাস্তরে পৌছে যান। তাই দেবকূলে জন্মলাভ সকল মানুষের কাম্য। সেই দেবকূলে একমাত্র দেবগণই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারেন।

"কুধু গেলা সঙ্গী ভেই
সাধি সমারে চলি যেই।"

শিবচরণ সেই দেবপুরীতে একা যেতে চান না। তাঁর সাথে যারা আছে তাদেরকেও সঙ্গে নিতে চাহেন। শিবচরণ তাঁর প্রার্থনা শেষ করেছেন। এখন তাঁর যাবার সময় হয়েছে। তিনি এখন কে কোথায় আছে তার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তাদের তিনি উচ্চ স্বরে ডাক দিচ্ছেন এক সঙ্গে যাওয়ার জন্য। যদি তারা বাদ পরে যায় তাহলে পরে আপসোস হবে। মানব কূলে কাউকে একা ফেলে যেতে চান না তিনি। গোজেনের কাছে তাঁর প্রার্থনা, অবুঝরা ও পাপীরা যেন তাদের পাপ থেকে মুক্তি পায়। গোজেনের কাছে তাঁর আকুতি যেমন করুণ তেমনি সঙ্গীদের কাছে তাঁর আবেদন আবেগময়, স্নেহপূর্ণ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক।

শিবচরণের ঘনিষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ ও তাদের দ্বারা বর্ণিত ধারাবাহিক লোক কাহিনী হতে তাঁর জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চাকমা জাতি ক্ষুদ্র হলেও অতি প্রাচীন জাতি হিসাবে ব্রহ্মদেশ, আরাকান ও বাংলাদেশের ইতিহাস হতে পাওয়া যায়। নানা উত্থান পতন ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে চাকমা জাতি আজও টিকে আছে। যুগের

আবর্তনে যখন যে রাজশক্তি প্রবল হয় তখন চাকমারা সে শক্তির প্রভাবিত হয়ে পড়ে। চাকমা রাজা জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, শের মুস্তখাঁ, ধরম বক্স খাঁ। তেমনি এককালে চাকমারা আরাকানী নামও ধারণ করেছিলেন। চাকমা রাজারা মুসলমানী খাঁ উপাধি ধারণ করায় তারা কি ধর্ম পালন করেছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছিল। চাকমারা কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করে না যে তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাদের বিশ্বাস চাকমা জাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ "আগরতারার" অনুসারী হয়ে তারা রাজকার্য ও ধর্মীয় কাজ করেছিলেন। ঐ সকল রাজাগণের ধর্মীয় নীতি পালনের সমর্থনে বৌদ্ধ বা হিন্দু মন্দির বা মসজিদ নির্মাণের কোন নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। সর্বশেষ খাঁ উপাধি ধারণকারী রাজা ধরমবক্স খাঁ ১৮৪৪ খৃঃ মারা গেলে তাঁর স্ত্রী কালিন্দীরাণী রাজা হন। তিনি সে সময় বিকৃত ধর্মীয় পালনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তিনি সে সময় হারবাঙ হতে বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবিরকে আমন্ত্রণ করে এনে বৌদ্ধ ধর্মের নবরূপ দেন। মহাযানী ধর্ম হতে হীনযানী ধর্মে প্রতিষ্ঠা করেন। চাকমাদের প্রাচীণ ধর্মগ্রন্থ 'আগরতারা" শাস্ত্র বাদ দিয়ে "ত্রিপিটক" শাস্ত্র মতে বৌদ্ধ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আরকান হতে বৌদ্ধ ধর্মীয় বই এনে বৌদ্ধ রঞ্জিকা নাম দিয়ে চাকমাদের মধ্যে প্রকৃত বৌদ্ধ বাণী পৌছান। এসময় সমতল এলাকায় বৌদ্ধ বড়ুয়ারাও রাণীর অনুগামী হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন দেশ হতে ত্রিপিটক গ্রন্থ এনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে থাকেন, জানা যায় যে কালিন্দী রাণী চাকমা রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে যশস্বিনী ছিলেন। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলেন বলেও জানা যায়। তাঁর সময়ে তাঁর জমিদারীতে বৌদ্ধ মন্দিরের উন্নতির সাথে সাথে হিন্দুদের জন্য মন্দির ও মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণেও অকাতরে দান করতেন বলে জানা যায়।

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও তাদের সংস্কৃতি এখনও অটুট রয়েছে। মহাযানী ধর্মের বিকৃতরূপে চাকমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ আগর তারার অনুশাসনে তারা অনেক কিছু অবৌদ্ধিক কাজ করত। মৃতলোক সৎকার, রোগভয়, জ্যোতিষ চর্চা, বাঘ ভালুকের ভয় হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তন্ত্রশাস্ত্র, জাতি উদ্ধার ভাতদ্যা ধর্মকাম সাতদিন্যা, থানমান্য, চুঙুলাং পূজা, ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবন চলার পথে সংস্কার গুলো এখনো পরিত্যাগ করতে পারে নাই। বংশের মধ্যে কেউ বাঘের হাতে মারা পড়লে চাকমারা উহাকে "ফি" নামে আখ্যায়িত করে "বুরপারা" পূজা করে। বৈদ্যরা গোষ্ঠির প্রত্যেককে মাথা ধুইয়ে দিয়ে পবিত্র করে। বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীল অনুসারে "মধ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" সামাজিক পূজা পার্বণ বৈদ্যের গৃহে, আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে রাজ পরিবারের সম্ভ্রান্ত লোকের সাথে দেখা করতে গেলে মদের বোতলকে সম্মান সূচক উপহার ধরা হত। দ্বিতীয়তঃ প্রাণী হত্যা মহাপাপ হলেও চাকমারা তা পালন করে না। গাংপূজা গাতমারা, ভুতপূজা ইত্যাদিতে তারা প্রাণী হত্যা করে পূজা করে। আগরতারা মন্ত্রগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর উচ্চারণ করা হয়। সে গুলোর অর্থ বৈদ্যরা ও লুড়ীরা যেমন বুঝেন না তেমনি বুঝেন না শ্রোতারা। সেগুলো হলো দেবতার বাক্য। এ

দেবতাগুলো হলো চুলামুনি, দেবরাজ ইন্দ্র, মালেন দেবতা, আজিঙ্গ, প্লেমা, প্রুম্মা, মালেনতে, আরিঙা মিডিঙা যুগ ইত্যাদি।

সেই আগরতারা প্রচলন সময়কালে শিবচরণের জন্ম হওয়ায় তিনিও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নাই। বারবার দেবদেবী, মা সরস্বতী, মা বসুমমতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। চাকমাদের মধ্যে নিরক্ষর হয়েও এবং কোন গুরুজনের কাছে শিক্ষা না নিয়েও স্বচেষ্টায় দৈবশক্তির অধিকারী হওয়া যায়। জনশ্রুতি মতে বিলাইছড়ি উপজেলার কেরংছড়ি মৌজায় জনৈক আলীচান চাকমা নামে এক ব্যক্তিও সেরূপ দৈব শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৬০-৮০ইং সন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন স্থানে গেলে চোখের পলকে ইচ্ছামতো জিনিষ তৈরী করে দেখাতো কিন্তু পরবর্তীতে বার বার এ শক্তি ব্যবহার করায় সে শক্তি হারিয়ে ফেলে। তিনি একসময় ভাল বৈদ্য হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন।

চাকমা রাজা সাত্তুয়া বা পাগলা রাজাও অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। চাকমা সমাজের "পেট্রোয়া" ফকির নামে একজন ফকিরও ঐরূপ শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে শুনা যায়।

পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত লোক কাহিনী হতে জানা যায়- শিবচরণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি একস্থানে হঠাৎ অর্ন্তহিত হয়ে অন্যস্থানে আবির্ভূত হতে পারতেন। চাকমাদের পানি খাওয়ার জন্য মাটির সরাই বা "কট্টি" নামে নলটি খুবই সরু। ইহার ভিতর দিয়ে ছোট পুতুলের ন্যায় তিনি তাঁর মায়ের সামনে এসে বের হতে পারতেন। গান গেয়ে তিনি কোন সময় পাড়া হতে চলে গেলে স্নেহ বশতঃ তাঁর মা তাঁরজন্য ভাতের মোচা বেঁধে যত্ন সহকারে ফুরবারেঙে রেখে দিতেন। তিন চার দিন পর বাড়ী ফিরে আসলে তাঁর মা এবং বৌদির কাছে ভাতের মোচা চাইলে মা ও বোদি তাচ্ছিল্য ভরে পুরাতন ভাতের মোচা দেখিয়ে দিতেন। কি আশ্চর্য! তখন তারা দেখতে পেতেন ভাতের মোচা খোলামাত্র সেখান হতে গরম গরম ভাপসা উঠছে আর শিবচরণ মনের আনন্দে মোচা হতে গরম ভাত খাচ্ছেন। তা দেখে পরিবারের সবাই এবং পাড়া প্রতিবেশীরা বিস্মিত হতো।

শিবচরণের অলৌকিক শক্তির ব্যাপারে আর একটি লোক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর বাল্য সখা 'চিদং' নামে এক লোক তাঁর নিত্য সহচর ছিল। তিনি তার কাছে সব মনের কথা খুলে বলতেন। তাকে তাঁর অলৌকিক শক্তিও দেখাতেন। পথে বের হয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যেতেন তাঁরা এক নিমিষে। এভাবে দিন চলতো তাদের হাসি আনন্দ সুখ ও দুঃখের মধ্যে। কিন্তু চিদং তাঁর বন্ধু ছিল বটে, তিনি কিন্তু শিবচরণের মত অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল না। জগতের মায়া

মমতাও সে ত্যাগ করতে পারে নাই। তাই সে কোন কোন সময় তাকে পরিহার করে চলতেন।

একদিন শিবচরণ অলৌকিক শক্তি বলে তাঁকে কোথাও নিয়ে গেলেন। চিদং সে জায়গা চিনেনা। মনে হলো এক নতুন রাজ্যে সে এসেছে। ইহার চারিপার্শ্বের সবকিছু দেখতে সুন্দর। পৃথিবীর মত সেখানেও বর্ষা নামে। ছেলে মেয়েরা নানা রঙের পোষাক পরে খেলাধূলা ও আনন্দ কলরব করে। চিদং কিন্তু সে সবকিছু বুঝেনা। তখন একসময় আকাশে মেঘ করেছে; ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায় আকাশ। দেয়ার গুড়গুড় আওয়াজ হল। ক্ষণিকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। পৃথিবীতে সেসময় ছিল বৈশাখ মাস। বৈশাখ মাসে পাহাড়ে জুমিয়ারা কাজের জন্য পাগল হয়ে উঠে। এতদিন পর্যন্ত জুম কেটে তাতে আগুন দিয়ে কাঠখর পোড়ানো হয়েছে সমস্ত জুম ক্ষেতের যাবতীয় জঙ্গল সাফ করে বীজ বপণের জন্য উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে।

চিদংয়ের সব কথা মনে পড়ে সেসময় ভাবালুতায় আবিষ্ট হয়ে। কিছুদিন পূর্বে বৎসরের প্রধান উৎসব বিঝুপর্ব উদযাপিত হয়েছিল চাকমাদের পাড়া গ্রামে। তিন দিন উৎসবের মধ্যে ফুলবিঝু, মূল বিঝু ও গর্য্যা পর্যা দিন। এ তিন দিন উৎসবে তারা গোঁয়াই মূর্তির সামনে ছাড়াও নদীর পাড়, গোলাঘরে, গোহালে, ঢেঁকিশালে সবখানে বাতি জ্বালিযেছে। তাদের বিশ্বাসমতে সে সময় দেবদেবীরা ভক্তি শ্রদ্ধা গ্রহণ ও আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য চাকমাদের ঘরে বেড়াতে আসে। তাদের স্বাগতম জানানোর জন্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। মূল বিঝুর দিন কি আনন্দ! ঘরে ঘরে তখন নানা ধরনের পিঠা খাওয়ার আনন্দ। ছোট ছেলে মেয়েরা ঘরে ঘরে গিয়ে মোরগ মুরগীদের খাবার দেয়। বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সালাম করে কপালে টিপ দিয়ে দেয়। তাদের কাছে আশীর্বাদ চায়। অপরদিকে গ্রামে মাঠের মধ্যে বটগাছের ছায়ায় ছেলে মেয়েরা নানা খেলা করে। ঘিলা, লাটিম, ফোরখেলা, একদাক্যে খেলা। কোন কোন জায়গায় বলি খেলার আয়োজন হয়েছে তিনদিন শুধু মানুষের জন্য উৎসব নহে। পশু পাখীদের জন্যও উন্মুক্ত হয় আনন্দ। গোহালের গরু মহিষগুলোকে ছেড়ে দিয়ে রাখালেরা পিঠে স্নেহের চাপড় দিয়ে বলে, "আজ বিঝু, যাও বাবা, আজ চড়ে বেড়িয়ে খাও, দুষ্টমি করিছনা, বিকালে আবার গোহালে ফিরে আসিছ।" গরু মহিষগুলোও হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার আনন্দ, কলরবে কেউ কেউ আবার লেজ তুলে লাফাতে লাফাতে চলে যায় সামনের মাঠে। বিঝুর দিন কেউ যেন উপোষ না থাকে সেদিকে তারা লক্ষ্য রাখে। তাই তাদের এসব আয়োজন। মূল বিঝুর দিন সকাল হতে খাওয়া দাওয়া হেসে খেলে অনেকে গান গেয়ে কেউ কেউ মদ্যপান করে আনন্দে কেটে দেয়। অতিরিক্ত ভোজন ও মদ্যপানে অনেকের উত্থান শক্তি থাকে না। গড়াগড়ি দিয়ে দিন কাটায়। এজন্য চাকমারা ঐদিনকে গর্যাপর্যা দিন বলে। বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ

ঐভাবে তারা দিন কাটিয়ে দেয়। ঐ তিন দিনের উৎসবে তারা সকাল বেলা স্নান করে শুদ্ধ সাঙ্গ হয়ে দেবতার আরাধনা করে। ঐ সময় পাড়ায় ওঝা বৈদ্যরা নানা ধরনের তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে "ঘরবন" করে তাবিজ দেয়, মন্ত্র পুত পানি পান করায় সারা বছর অসুখ বিসুখ থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

এভাবে বসন্তকাল পেরিয়ে গ্রীষ্মে প্রবেশ করে বাংলার ষড় ঋতু। তখন গাছে গাছে সবুজ পাতার প্রাচুর্য। বনের পাখী কিচির মিচির পোকা মাকড়ের একটানা সঙ্গীত বেজে উঠে বনে। কান পেতে শুনুন, "সৃষ্টির কি অপূর্ব বাজার বসেছে সবখানে সবদিকে। নিদাগ ক্লিষ্ট দিনের পাখীরা, পোকা মাকড়েরা, মাটি, মৃত গাঙ, ছড়া সবাই আকাশের দিকে চেয়ে থাকে বৃষ্টির স্পর্শ পাওয়ার জন্য।

গ্রামের লোকজন কাজের জন্য উদগ্রীব থাকে। ইতিমধ্যে মেয়েরা জামাই নাতি পুতি নিয়ে শ্বশুর বাড়ী বেড়িয়ে গেছে। যাওয়ার সময় মেয়ে গরীব বাবার মুরগী ছানাটা, শাক শব্জীর বীজটা আব্দার করে নিয়ে গেছে। যাওয়ার বেলায় নাতি, নাতনীর আদর তাদের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, মন ভুলিয়ে দেয়। এসব কিছু চিদং ভুলতে পারেনা।

তাই সে সময় এই মায়া পুরীতে যখন দেয়া গর্জন করে বৃষ্টি নামে তখন চিদং ব্যাকুল হয়ে উঠে ঘরে ফেরার জন্য। সে আক্ষেপ করতে থাকে বারবার। হায়! হায়! তিনি যদি এতক্ষণ তাদের বাড়ীতে থাক্‌ত তাহলে কতই না কিছু করতে পারত! ছোট ভাই বোনদের আদর করত, পাড়া প্রতিবেশীদের স্নেহ মমতায় স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করা যেত। তার আক্ষেপ- এ সময় হয়তো আকাশের ছায়া পড়া তাদের গ্রামখানী অপরূপ রূপ ধারণ করেছে। দূরের পাহাড়ের শীর্ষে মেঘ জমেছে, বাসা বেঁধেছে সেখানে নানা ধরনের মেঘ। তারপর বাতাস প্রবাহিত হয়ে থমকে দাঁড়ানো মেঘ গুলোকে ছত্রখান করে দিচ্ছে। তখন হয়তো অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে দূরের এক পাহাড়ের ধারে। সে মেঘ কাঁপতে কাঁপতে বিদ্যুতের ঝলকানি দিয়ে সামনে এগিয়ে তারপর তাদের গ্রামে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা ঝরিয়ে যায় টুপ, টুপ শব্দে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পোড়ানো জুম ক্ষেতে পড়ে মাটিকে মখমলের মত নরম করে দেয়। সে স্মৃতি বৈশাখ মাসে নিত্য বছরে আসে। চিদং যেতে চায় এ মুহূর্তে তাদের গ্রামে। মাতোয়ারা হতে চায় আনন্দে। বৃষ্টির ছৌয়া পেতে চায় উপভোগ করতে চায় সে আনন্দ।

শিবচরণ চিদংয়ের মনের কথা জেনে ভাবলেন, "বাল্যবন্ধু চিদংকে এতদিন পর্যন্ত শিখালাম, বুঝালাম, মনের কথা খুলে বললাম। সংসারী হওয়ার দুঃখের কথা বললাম, কিন্তু তাতে কোন লাভ হলনা। বাটির চামচ যেমন সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পায় না, তদ্রুপ শিবচরণও তাঁকে বুঝল না, তাঁর দেখানো পথ চিনল না। তার পূর্বজন্মের কোন কুশল কর্ম নাই। তাই আধ্যাত্মিক জগতে আরোহণ করে পরম সুখ অনুভব করার তার অধিকার নাই। ভবিষ্যৎ জন্মে মঙ্গলও সে চায় না। ইহকালের সুখ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায। সুতরাং শতবর্ষ ব্যাপী তাঁর সঙ্গে থাকলেও তার কোন লাভ হবে

না।" এরূপ অবস্থা বুঝে শিবচরণ চিদংকে বললেন, "চিদং, তুমি কি সত্যি বাড়ী যেতে চাও?" চিদং আনন্দিত মনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "বন্ধু, কিছু দিনের জন্য বেড়িয়ে আসতে চাই, আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো, মা বাবা ভাই বোনদের একবার দেখে এসে। তাঁদের জন্য বড়ই মন প্রাণ কাঁদছে।"

শিবচরণ বললেন "তা হলে চোখ বন্ধ করে রাখ, যতক্ষণ না আমি তোমায় বলি, খোল।"

চিদং চোখ বন্ধ করে মনে মনে অনেক কিছু ভাবে। কিছুক্ষণ পর হতাৎ চোখ খুলতেই দেখে তাদের ঘরের আঙিনায় সে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল, তার মা মুরগীদের খুদ দিচ্ছেন। ঘরের আঙিনায় বাঁধা গাভীটা হাম্বা, হাম্বা রবে ডাক দিচ্ছে বাছুরকে কাছে পাওয়ার জন্য। সে আরও দেখল তাদের পাড়ায় কোন বৃষ্টি হয় নাই। আশ পাশের মাটি যেই রুক্ষ দেখেছিল সে রুক্ষই রয়ে গেছে। এখানকার মাটি ও প্রাণীরা পানির জন্য ছট্‌পট করছে। ঐ সময় ছড়াছড়ির পানিও শুকিয়ে যায়। গ্রামের পাশে পাতকূয়া থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে গৃহপালিত গরু মহিষ ও ছাগলদের পানি খাওয়ানো হয়। চিদংয়ের মা তাকে দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওরে, ও চিদং, তুই এতদিন কোথায় ছিলে রে। তোকে খুঁজতে খুঁজতে আমরা হয়রান হয়েছি। তোমাকে ভুতে লুকালো বলে ভুতের নামে ঘরের বড় মোরগটা বলি দিয়েছি।"

চিদং কিছুই বলল না, "মনে মনে ভাবল, এ আমি কি দেখেছিলাম, সেখানে অঝোর ধারায় বৃষ্টি, কল কল রবে ছড়াছড়ি উপচে পড়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ এ স্থানে কোন ঝড়বাদল নাই। শুষ্কতায় মরুভূমির মত হয়েছে। তার মনে মনে আপসোস এল, তার বন্ধু শিবচরণের সাথে কতস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে, কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখেছে। তখন তার ছিলনা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, ছিল না সাংসারিক কোন ভাবনা ও যন্ত্রণা।" সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে, এ পৃথিবীতে আবার মায়া জ্বালে জড়িয়ে পড়ছে।

ফুরেইয়ে ছ' লামা ফুরেল
গোজেন চরণৎ মন রল।"

শিবচরণ তাঁর ছ' লামা গীত গাওয়া শেষ করেছেন। তাঁর যাবতীয় প্রাপ্য প্রার্থনার মাধ্যমে পরম গোজেনের কাছে সমর্পণ করেছেন। তিনি এখন গোজেনের কাছে সম্পূর্ণ মন রেখেছেন। সময় ও সুযোগ এলে তাঁর প্রার্থনা অনুসারে গোজেন তাঁকে পুনর্জন্ম দিয়ে তাঁর প্রার্থনা গুলো পূরণ করে দিবেন। তিনি প্রার্থনা স্থান ত্যাগ করে যেখানে যান না কেন গোজেনের কথা ভুলবেন না। এ তাঁর শেষ কথা।

চিদংকে বাড়ীর কাছে রেখে এসে শিবচরণ আবার উধাও হয়ে গেলেন। তিনি সংসারী নহেন। অনন্ত পথযাত্রী তিনি। তাঁর কোন বন্ধন নাই। উন্মুক্ত ও অবারিত তাঁর গমণ পথ, আকাশের তারায় তারায়, সূর্যালোকে, বাতাসের ছম ছম শব্দে ও শীতের মৃদুমন্দ কাঁপনে শিবচরণ ঘুরে বেড়ান মনের আনন্দে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফিরে দেখা ঃ

উত্তর ব্রহ্মের চাকমা রাজা সেরমত্যার (১২০০ খৃঃ রাজধানী মনিজাগিরি) রাজত্ব কাল হতে চট্টগ্রামস্থ চাকমা রাজা শেরমুস্ত খাঁর (১৭৩৭ খৃঃ রাজধানী আলীকদম) রাজত্বকাল পর্ব ছিল চাকমা জাতির ঘটনাবহুল সময়। এসময় রাজা মানিকগিরি (১৪১৮ খৃষ্টাব্দে) বা মারেকাস চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। কথিত আছে যে ঐ সময় গৌড়ের সুলতান রাজা গণেশের পুত্র জালাল উদ্দীনের নিকট ১২ খানি গ্রামে বসবাসের অধিকার পেয়ে তিনি আলী কদমে রাজধানী স্থাপন করেন। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী চাকমাদের ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস। এ সময় চাকমারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আনক্যা ও রোহিঙ্গা চাকমা নামে পরিচিতি লাভ করে। এ দীর্ঘ সময়ে চাকমাদের মধ্যে বাঘা বাঘা সাহসী রাজার জন্ম হয়েছিল। রাজা জুনু, ১৫১৬ খৃঃ রাজা সাত্তুয়া (১৬৩৮ খৃঃ) বা পাগলা রাজার মত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। মোগল শক্তি, ত্রিপুরা রাজা ও আরাকানী রাজার সামরিক শক্তিছিল সেসময় প্রবল। সে সময়ও চাকমা রাজা নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে নিজের সিংহাসন ও প্রজাদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সে সব ইতিহাস এখনো সাক্ষ্য দেয় এককালে আলীকদম হতে আরও ১৬ মাইল অভ্যন্তরে রাজাবিল লামক স্থানে সাময়িক ভাবে চাকমা রাজার রাজধানী স্থানান্তরের কথা। অধুনা রামু থানার চাকমা কুল ও রাজা কুল ছেড়ে আসার কথা বড়ই বেদনার্থে তাঁরা স্মরণ করে থাকে।

চাকমারা এখনো স্মরণ করে মাতামুড়ীর নাম। তৎসঙ্গে গাভুরমুড়ি ও বুড়ামুড়ি। রাজধানী আলী কদমের ১৭ মাইল উত্তরে ধামাই পাড়া, উত্তর ধুর্যা দীঘির পাড় ও বাকখালী। সে বাকখালিতে মগ রাজার সাথে চাকমা রাজার যুদ্ধ হয়েছিল জবর। এ যুদ্ধে মগরাজা সন্ধি করতে বাধ্য হন। চাকমাদের অবাস স্থল আলী কদমের অদূরে চাকমাকুল দঃ পাড়া, রাজাকুল, ওয়াংঝামূড়া সেন্দুইজা, রাজধানী লামা গ্রাম-রাজঘাটা ইত্যাদি এখনো চাকমাদের অতীত স্মৃতি ধারণ করে আছে।

"১৫২০ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার সহিত চাকমা রাজা বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটিয়ে চাকমা রাজা জুনু (মগেরা বলে চনুই) স্বাধীন ভাবে তদীয় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা দেবমানিক্য পুনঃ চট্টগ্রামের উত্তরাংশ

অধিকার করেন। কিন্তু উহা বেশী দিন স্থায়ী ছিলনা। হুসেন শাহের পুত্র নছরত শাহের পুত্র পরাগল খাঁ আবার চট্টগ্রামের ঐ অংশ জয় করেন। আবার ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পুনঃ বিজয় মানিক্য ঐ অংশ অধিকার করেন। এই ভাবে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে অমর মানিক্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে চাকমা রাজ্য আক্রমণ করিলে, চাকমা রাজা ও আরাকান রাজায় সম্মিলিত বাহিনীর নিকট ত্রিপুরা রাজা গুরুতর রূপে পরাজিত হন। কিন্তু ত্রিপুরা শ্রীশ্রী রাজা মালায় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-

"সেই স্থান ছাড়িয়া আইসে কর্ণফুলী
মগ সৈন্য পাছে পাছে আসিল সকলি।"

ত্রিপুরা রাজা কল্যাণ মানিক্য ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি পুনরায় ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু মগরাজা বার বার পরাজিত হইলে পুর্তুগীজগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাতে ত্রিপুরা রাজা পরাজিত হন এবং পরবর্তী বৎসর আরাকান রাজা পুর্তুগীজগণের সাহায্যে উদয়পুরে পর্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ইহার পর আর ত্রিপুরা রাজা চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন নাই।

সুত্র ঃ- চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত -বিরাজ মোহন দেওয়ান

সম্ভবত চাকমারা সেই সুযোগে মাতামূড়ী নদীর পাড় হতে কর্ণফুলী বিধৌত অঞ্চলে এসেছিল।

সে সময় চাকমা রাজারা বেশ অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাদের হাতি ও ঘোড়া ছিল প্রচুর। তারা স্বাধীন রাজা হিসাবে কোন মুদ্রা প্রচলন করতে পারেন নাই। বৈদেশিক সম্পর্কেও তেমন দলীল দস্তাবেজ নেই যার দ্বারা প্রমাণ করা যেত যে চাকমা রাজারা শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এরূপ সংস্কার করেছেন।

প্রকৃত পক্ষে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদাভাবে বিভক্ত করায় এবং চাকমা সার্কেলের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ায় চাকমা রাজ্যে সুস্থিতি লাভ করে। চাকমা রাজার ঐতিহ্যবাহী আভিজাত্যবোধ সেই প্রাচীনকাল থেকেই। প্রাত:স্মরণীয়া রাণী কালিন্দী চাকমা রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাণী ছিলেন। তিনি রাঙ্গুনিয়ায় জমিদারী পরিচালনা করার সময় বহু কীর্তি ও নিদর্শন তাঁর এখনও বর্তমান রয়েছে। রাণীর বহুকীর্তি গাথার মধ্যে রাণীর পশু প্রীতি অন্যতম। শুনা যায় তাঁর সময়ে রাজবাড়ীতে অনেক হাতি ও ঘোড়া ছিল। সেসময় "গোলবদনী" নামে তাঁর এক প্রিয় হস্তিনী ছিল। ১৮৭৪ইং সনে যেদিন রাণী কালিন্দী মারা যান ঠিক সে দিন গোল বদনী হস্তিনীর চোখেও নামে অশ্রান্ত অশ্রুধারা। রাণীর শোকে উহাও

মারা গেল কাতরাতে কাতরারে। পশুর সাথে মানুষের যে গভীর প্রেম প্রীতি রয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ ঘটনা। এ ঘটনার সংবাদ সহসা রাষ্ট্র হয়ে গেল দিকে দিকে। ফলে চারিদিক হতে সহানুভূতির গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেল রাণীর প্রতি।

রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে রাণী যখন বৃটিশ সরকার ও প্রজাদের নানা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। সে সময় তাঁর স্বজাতীয় প্রজারা সমতল এলাকার উর্বর ক্ষেত্র ত্যাগ করে বিপুল সংখ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন বসতি স্থাপনে ব্যস্ত থাকে। চাকমা রাজাও তখন বাধ্য হয়ে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর হতে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী পরিবর্তন করেন। কারণ তখন বৃটিশ সরকার এক আইন করেছে যে প্রত্যেক উপজাতি প্রধানকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতে হবে।

সে সময় রাঙ্গুনিয়া হতে রাঙ্গামাটিতে রাজধানী স্থানান্তরের সময় বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র, জমিদারীর দলীলপত্র, সৈন্য সামন্তের দ্বারা ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র, ঢাল তলোয়ার অযত্নে ও অবহেলায় হারিয়ে ফেলেছে বলে জানা যায়।

কাপ্তাই বাঁধের পর রাঙ্গামাটির পুরানো রাজবাড়ী হতে বর্তমান রাঙ্গামাটির রাজবাড়ীতে মালামাল স্থানান্তরের সময়ও অনেক প্রাচীন ও মূল্যবান দলীল হারিয়ে যায়।

বর্তমান চাকমা রাজবাড়ীর ঐতিহ্য বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। অথচ উহা ছিল একসময় চাকমা জাতির গৌরব অহংকার। প্রাচীন ভারত বাংলাদেশের রাজা ও জমিদারগণের ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদ, দীঘি শত শত বৎসর যাবত অবস্থিত থেকে তাঁদের গৌরব ও কীর্তিগাথা ঘোষণা করছে। অথচ চাকমারা ভ্রাম্যমাণ জাতি হওয়ায় সেগুলো ধরে রাখা সম্ভব হয় নাই। বিজাতীয় দখলে থাকায় কোন কালেই সে সব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। চাকমা রাজার সঙ্গে অন্যান্য জমিদারদের পার্থক্য এই যে, এক সময়ে সে সব জমিদার তাঁদের কীর্তিগাথা রেখে ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়েছেন; অপর পক্ষে চাকমা রাজা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির রাজা হলেও সেই সুদীর্ঘকাল হতে টিকে আছেন তাঁদের ঐতিহ্য যতই জীর্ণ শীর্ণ হোক না কেন।

চাকমা জাতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিল অনুন্নত। জীবনটা যায় যদি যেমন কেটে যাক না। নিজস্ব ভাষা থাকলেও উহার মাধ্যমে কোন সাহিত্য চর্চা ছিল না। তাই মুখে মুখে স্মৃতির উপর নির্ভর করে কোন জাতির গৌরব, ঐতিহ্য দীর্ঘদিন টিকে রাখা সম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে ১৯০৯ ইংরেজী সনে চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত লেখক বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐতিহাসিক নানা তথ্য উপাত্ত এবং সামসাময়িক কালের বৃটিশ সরকারের সরকারী আদেশ নির্দেশাদি নিয়ে যদি চাকমাদের ইতিহাস না

লিখতেন তাহলে অবহেলায় ও অজ্ঞতায় তাদের ইতিহাস বিকৃত ও লুপ্ত হয়ে যেত। শত বৎসর পূর্বে চাকমাদের ধারাবাহিক ভাবে প্রচলিত হয়ে আসা রূপ কথা, উপকথা, কবিতা, রাজাদের কীর্তিগাথা তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর বইয়ে। উক্ত বহিটি ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়ে বিশ্ব সাহিত্যে ও প্রত্নতত্ব গবেষণায় স্থান লাভ করায় চাকমা উপজাতি বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে বিজাতি হয়েও বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় চাকমা জাতির ইতিহাস লেখক হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে থাকবেন নিঃসন্দেহে।

আমাদের আলোচ্য শিবচরণের "গোজেন লামাটিও" তাঁর চাকমা জাতির ইতিহাসে স্থান পায়। তাই দেখা যায় চাকমারা শিবচরণকে যতই আপনজন পরিচয় দিক না কেন বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের লিখিত লেখার মধ্যেই তাঁদের অবস্থান করতে হয়েছে। ইহার বাহিরে চাকমা গবেষকরা অদ্যাবধি অতিরিক্ত কোন তথ্য দাখিল করতে পারেন নাই।

শুনা যায় শিবচরণ সংসার জীবনে আবদ্ধ হতে চান নাই। যৌবন কালে তাঁর মা তাঁকে বিবাহ করে সংসারী হওয়ার কথা বললে তিনি মাকে কবিতাচ্ছলে তা বুঝিয়ে দিতেন।

ওমা! ছরমা কুড়ায় ন খায় খুদ
অবুজ মনে ন পায় বুজ।

তাঁর মাতা ছিলেন অবুঝ। তিনি তাঁকে বুঝতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি তাঁকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান। সংসার করার মত তাঁর অবস্থা নেই। যতটুকু পাওয়ার জন্য তিনি গোজেনের কাছে প্রার্থনা করেছেন সে সব কিছু তাঁর মায়ের পক্ষে পুরে দেওয়া সম্ভব নহে। তাছাড়া তাঁর প্রার্থনাও ব্যর্থ হবে। তিনি সংসারী হয়ে পাপ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে পরম গোজেন ভবিষ্যতে তাঁর আশা পূরণ করবেন না। তাই তিনি যেমন আছেন নিষ্পাপী হয়ে থাকতে চান।

সনাতনী বিশ্বাস মতে চাকমারাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর আবর্তনে সত্য, ত্রেতা, দাপর ও কলিযুগ আসবে। পর্যায় ক্রমে এ চারটি যুগ আবার আসবে। বর্তমান কলিযুগ চলছে। এ যুগে কোন কিছুতে সত্যতা নাই। কোন মহামানবও কলিযুগে জন্ম নেয়না। শিবচরণ তাই কলিযুগে মৃত্যু হয়ে আবার কলিযুগেই জন্ম নিয়ে দুঃখ ভোগ করতে চান না। তাতে পাপ পঙ্কিলতায় লিপ্ত হয়ে জন্ম শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হবে।

সুসময়ে ও সুক্ষেণে জন্ম নিলে মহামানবের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। "আরিয়া মিডিঙা, যার জনম, আগে সালাম দ্যং তার চরণ।" সেই সম্যক সম্বুদ্ধ আর্যমিত্র বুদ্ধের

চরণে তিনি সালাম রেখেছেন সে কালে জন্ম নেওয়ার জন্য। সে সময়ে জন্ম নিলে, তিনি তার যাবতীয় কাম্যবস্তু পেয়ে দুঃখ মুক্তি নির্বাণ লাভ করতে পারবেন। বার বার জন্ম নিয়ে আর তিনি সুসময় হারাতে চান না। কারণ একবার জন্ম নিলে মৃত্যুর অধীন হয়ে বার বার জন্ম ধারণ করতে হবে। তাঁকে একটার পর একটা কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তিনি অকালে কিছুতেই জন্ম নিবেন না।

পরম গোজেনের কৃপায় তিনি ইচ্ছা মৃত্যুর শক্তি লাভ করবেন। ততদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন যতদিন সে সময়টা না আসে। তিনি ধ্যানাস্থ অবস্থায় জীবিত থেকে সৃষ্টি, ধ্বংস ও উৎপত্তি প্রত্যক্ষ করবেন। কালাকাল অতিক্রান্ত হলে তিনি বের হয়ে আসবেন আপনার অবস্থান থেকে। তিনি তখন সুদিন ও শুভক্ষণ দেখে জন্ম নিয়ে বহুদিন সুখে সাঁতরিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন।

শিবচরণের জীবন যাপন ও তাঁর অর্ন্তহিত হওয়ার ব্যাপারে নানা কল্প কাহিনী আছে। শুনা যায় একসময় শিবচরণ তাঁর বন্ধু বান্ধবগণসহ এক বিশাল পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। সে পাহাড়টি পৃথিবী সদৃশ নানা প্রাণী সমাকুল অবস্থায় সুন্দর। ঝর্ণার ঝুম ঝুম শব্দে মাতোয়ারা ছিল মন। প্রস্ফুটিত কুসুম সকল গাছের শাখায় শাখায় ঝুলছিল। নানা পাখীর কুজনে বনপ্রান্তর মুখরিত, রমণীয় তারূপ নিসর্গ। সে পাহাড়ে ছিল নানা বর্ণের নানা আকারের পাথর দেখতে খুবই চমৎকার। নিত্য দিনের সৃষ্টির আনন্দে মূখর ধরিত্রী। সৃষ্ট জীব জগতের গানের লয়তানে মূর্ছনায় আমোদিত ছিল প্রকৃতি। শিবচরণ স্বভাব সুলভ বেশে দু'হাত জোড় করে একটা বড় পাথরের উপর গিয়ে বসলেন। ক্রমে সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী সাথীরা শিব চরণের ধ্যান ভেঙ্গে যাক-অপেক্ষা করতে করতে কেউ ঝর্ণার সুশীতল জলে অবগাহণ করছিল, কেউ কেউ গল্পে মশগুল ছিল। কিন্তু বেলা শেষে ঘরে ফেরার পালা হলে দেখা গেল শিবচরণ আর সেখানে নেই। তাঁর গলায় পেঁচানো সাদা কাপড়টি পাথরের এক কোনায় আটকে গিয়ে ফির ফির করে বাতাসে উড়ছে কেবল।

ক্রমে উঁচু পাহাড়ের অন্তরালে সূর্য হেলে পড়ে সন্ধ্যা সমাগত হল। শিবচরণ আর কোথাও হতে ফিরে আসলেন না। বিমর্ষমুখে ফিরে আসল তাঁর বন্ধুরা পাড়ায়।

সে কথাটি ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গ্রামে। অনেকেই বলে, "শিবচরণ পাথর হয়ে গেছেন। পাথরের রূপ ধারণ করে তিনি অপেক্ষা করে আছেন সুদিন আসার জন্য।" এভাবে শিবচরণের অর্ন্তধান রহস্য আজও রয়ে গেছে ঘুরে ফিরে জনতার মুখে মুখে।

পুনশ্চ- সাধক শিবচণের মত চাকমাদের মধ্যে আরও অনেক জ্ঞানী ও গুণী সাধক ছিলেন তাদের নাম এখনো অজ্ঞাত। চাকমাদের গোষ্ঠিগত ভাবে জানা

থাকলেও তাঁদের নাম এখনো প্রকাশ পায় নাই। চাকমা রাজারা চট্টগ্রামে রাজত্বকালে ফরাচেং রাউলী, চান্দর্য্যা রাউলী, দাকুপ্যা রাউলী (চেঙ্গী মহাপ্রুম) বদল্যা রাউলী, হাড় ভাঙ্গা রাউলী (টেঙাছড়ি থুম) ঠান্ডেয়া রাউলী, ঘধরা রাউলী, থান রাউলী, খুদ্যা রাউলী, চান রাউলী সহ বহু বিখ্যাত রাউলী ছিলেন। তাঁরাই একসময় চাকমাদের বৌদ্ধ ধর্মের ধারক ও বাহক ছিলেন। চাকমাদের মধ্যে এখনো অনেক বৈদ্য আছেন যাঁরা প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে বড় বড় "তালিক শাস্ত্র" ঔষধ ও রোগ নির্ণয় ভেসজ বিদ্যার বই সিন্দুকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সেগুলো উন্মোচিত করলে অনেক কিছু শিখা যাবে, জানা যাবে। চাকমা জাতির এ ক্রান্তি লগ্নে যখন নিজস্ব জ্ঞান ভান্ডার শূন্য তখন সে সব কিছু কুড়িয়ে গবেষণা করলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস।

যেমন সেদিন রাঙ্গামাটির মানিকছড়ি নিবাসী চাকমা লুথাক চিরদিন চাকমা, নিজেকে একা একা লুড়ি পরিচয় দিতে ভয় ও লজ্জা পান। তাঁকে তাঁর কাছে আগর তারার পাণ্ডুলিপি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় কাপড়ের পুটলিতে বাঁধা চাকমা লেখায় লিখিত একটি মাঝারী আকারের বই এনে সামনে রেখে বললেন, "এখানে আগর তারার কিছু অংশ মালেনত্রা বহিটি আছে।" তিনি দুঃখ করে বললেন, "চাকমারা এখন আর এসব শাস্ত্র বিশ্বাস করে না, আমার ছেলে মেয়েরাও চায় না এ বইটি ঘরে থাকুক। তাই পার্শ্ববর্তী বিহারে জানালার ট্যাকে রেখেছি, নষ্ট হলেই হোক।" সেগুলো যতই অবহেলিত হোক না কেন চাকমা জাতির মূল্যবান সম্পদ। গবেষণার দ্বারা পুর্নজীবিত করলে তারা আবারও জেগে উঠবে সরবে।

কালজয়ী প্রতিভা শিবচরণের গান এখনো চাকমারা ভুলে নাই। তাঁর গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আজও আছে পাহাড় পর্বতে, গিরি কন্দরে, নদীর পাড়ে, লোক মুখে মুখে। কান পাতলে শুনা যায়-

"যেবর মাগে সে বর পায়
গোজেনে বর দিলে ন ফুরোয়।"

সে ভাষা কি ঘুমন্ত চাকমা জাতি শুনে? বুঝে কি তার অর্থ পরম গোজেন করুণাময়? তাঁর সম্পত্তি অফুরন্ত তাঁর শক্তি অসীম। তিনি সর্বজ্ঞ। ভক্তরা যা চায় তাঁর কাছে তারা তা পায়। তাঁর আশীর্বাদ রৌদ্রতপ্ত মূর্ছাহত ব্যক্তির উপর সুশীতল বারি সিঞ্চনের মত সুখকর। চাকমা জাতি ভাগ্যবান জাতি। যুগে যুগে তারা তাদের পথদ্রষ্টা মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে। তাই তারা এখনো টিকে আছে। শিবচরণের প্রশ্ন ছিল- "চাকমারা পরম গোজেনের কাছে ভক্তি ভরে প্রার্থনা করে তাদের কাম্যবস্তু চায় না কেন? তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ধর্মনীতি পালন করে না কেন? তা না হলে তারা সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয় কেন?"

সমাপ্ত

সম্পাদকের লিখিত ও সম্পাদনায় প্রকাশিত বই সমূহ ঃ

১। **পদচিহ্ন**- লেখকের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে অফিসার পদে চাকুরী জীবনে বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

২। **মালেনত্রা অর্থসার**- চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আগর তারার একাংশ মালেনত্রা অর্থসার। চাকমা লুড়ী প্রয়াত আঙু ফলচান কার্বারী (আগর শাস্ত্রী) কর্তৃক সংকলিত ও ভাবানুবাদের বাংলা অনুবাদ।

৩। **কঠিন চীবর দান স্মরণিকা ২০০৩**, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রথম সাধনা স্থান ধনপাতা সম্বন্ধে লেখা।

৪। **কঠিন চীবর দান স্মরণিকা-২০০৪**, শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রথম সাধনাস্থান ধনপাতা বনবিহারের ক্রমোন্নতি ও পবিত্র স্থানের বর্ণনা।

৫। **প্রবারণা-২০০৫,** ধনপাতা পাতা স্মরণিকা। সাধনা বনবিহার সংক্রান্ত।

৬। **কাচলং নদীর তীরে**- প্রকাশনার পথে।

চাকমার লেখার অক্ষর পরিচয়

চাকমার আম পুথি
অর্ধ পাঠ

চুচাগুয়া ^ ক্ষা	গুগাগুয়া ^ খা	চন্দ্যা ^ গা	ঘিনঘাগুয়া ^ ঘা	ঙিনগুয়া ^ ঙা
দ্বিচন্দ্যা ^ চা	মগাগুয়া ^ ছা	দ্বিগুন্দ্যা ^ জা	ঝাগুঝুয়া ^ ঝা	ঞিনগুয়া ^ ঞা
দ্বিনাগুয়া ^ টা	দুনাদ্বিয়া ^ ঠা	আড়ুচাগুয়া ^ ডা	বেঙ্গডগুয়া ^ ঢা	পেটুয়া ^ ণা
ঝঙদ্যা ^ তা	আগুদ্যা ^ থা	দোগুন্দ্যা ^ দা	তলগুয়া ^ ধা	মারবাগুয়া ^ না
পগুয়া ^ পা	উবর্ণ ফুলা ^ ফা	উবর্ণ ফুয়া ^ বা	ভেরগুয়া ^ ভা	সুগুয়া পগুয়া ^ মা
দ্বিগুয়া ^ যা	দ্বিদাগুয়া ^ রা	তলগুয়া ^ লা	ফুদি ফুকুয়া ^ সা, শা	উবর্ণ ফুয়া ^ ষা
দ্বিগুয়া ^ হা	^ একফুয়া	দ্বিফুদা	লন ফুদা	
সিহ্ ফুদা ^ ক্ষা	দেনগুয়া ^ ছি	বড়চি ^ উ	মেঙ্গউবা ^ এ	বাফুদ্যা ^ ওয়া

উবর্ণ ফুল (উক্ত পাঠ)

উবর্ণ ফুলা	মাত্যা (া)	একার (ে)	বাফ্যা (ি)	বর্ণি ফুদা (ী)
একটান (ং)	দ্বিটান (ঁ)	ওকার (ো)	ঔকার (ৌ)	একফুদা (ং)
দ্বিফুদা (ঃ)	চান ফুদা (ঁ)	দেন ভাঙা (ঙ্গ)	ওয়া মাত্রা	য-ফলা (্য)
র-ফলা (্র)	ল-ফলা	ম ফলা	হ-ফলা *	

* নি:দ্র: চাকমা বর্ণগুলিকে হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ করিতে হইলে বর্ণ গুলির নীচে ০(২) ফলা বসে. যেমন:-

মামা বাবা অকুলয় মোলমর

চিহ্নের ব্যবহার

বর্ণ		চিহ্ন			
ম	উবর তুল্যে	´	ম	ক	যেমন
ম	মাজ্যা	¯	ম	ক্	যেমন
ম	বান্যে	০	ম	কি	যেমন
ম	একটান দিলে	ু	ম	কু	যেমন
ম	এ-কার দিলে	ে	ম	কে	যেমন
ম	ও-কার দিলে	´ ০	ম	কো	যেমন
ম	দেল ভাঙিলে	ৈ	ম	কাই	যেমন
ম	য়া - দিলে	্য	ম	ক্যা	যেমন
ম	রা - দিলে	্র	ম	ক্রা	যেমন
ম	লা - দিলে	্ল	ম	ক্লা	যেমন
ম	ওয়া - দিলে	০	ম	কোয়া	যেমন
ম	হা - দিলে	্হ	ম	কাহ্	যেমন
ম	না - দিলে	্ন	ম	ক্না	যেমন
ম	একফুদা দিলে	ং	ম	কাং	যেমন
ম	দ্বিফুদা দিলে	ঃ	ম	কাঃ	যেমন
ম	চান ফুদা দিলে	ঁ	ম	কাঁ	যেমন

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

রেইংখ্যং নদীর উপত্যকায় গিরি নির্ঝর ও অরণ্যে শোভিত অখ্যাত কাংড়াছড়ি গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের মাচাংঘরে ৩১শে আগস্ট ১৯৪৫ইং লেখক শ্রী ইন্দ্র লাল চাকমার জন্ম। পিতা-সান্দ্রা চাকমা ওরফে নিশি কুমার ও মাতা-দয়ামুখী চাকমা উভয়েই ত্রিশরণে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৬০ ইং সনে কাপ্তাই বাঁধের কারণে তাঁরা বর্তমান বাঘাইছড়ি উপজেলায় জীবতলী গ্রামে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা শেষ জীবনে শ্রীমৎ শাক্যবোধি মহাস্থবির অবস্থায় ২০০২ইং সনে জীবতলী জেতবন মঙ্গল বিহারে পরলোক গমন করেন। দরীদ্র পরিবারের ছাত্র হিসাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ১৯৬৭ ইং সনে বিএ পাশ করার পর বাঘাইছড়ি উপজেলায় রূপালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৬৯-৭০ইং শিক্ষা বর্ষে বিএড প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর রাঙ্গামাটি শাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান, ১৯৭৬ইং সনে এপ্রিল মাসে থানা শিক্ষা অফিসার পদে যোগদান। ২০০০ইং সনে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে চাকরীর সুবাদে তিনি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় কর্মরত ছিলেন। ২০০২ইং সনের আগস্ট মাসে তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চঃ দাঃ) হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের প্রথম সাধনা স্থান ধনপাতা সাধনা বন বিহার উন্নয়নে একজন সক্রিয় কর্মী।